গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

নিদাঘের তীব্র দহনে উত্যক্ত বাংলা দেশ এখন বর্ষার স্পর্শে শান্ত। যদিও আজকের জীবনযাত্রা, এই ঋতুতে একটু ধীর হলেও, মানুষের রোজনামচায় তেমন কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়না, তবু বর্ষার ইলিশের স্বাদ আজও কোন বাঙালিই ভোলেননি। ঠিক তেমনই, বাঙালির সুসাহিত্য পাঠের ইচ্ছা... এই মুহূর্তে, বৃষ্টির প্রকোপ এড়াতে যে সাহিত্যপ্রেমী বাঙালি মানুষটি কোন সাময়িক আশ্রয়ের নীচে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর 'সেলফোনে'ও 'গুঞ্জন' পৌঁছে দিতে পেরে, আজ আমরা ধন্য...

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ১, সংখ্যা ২
জুলাই ২০১৯

কলম হাতে

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস, প্রণব কুমার বসু, মৌসুমী লাহিড়ী, ডাঃ অমিত চৌধুরী, মালা মুখার্জী এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য, পদ্য, নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

দূরের জানালা

(পর্ব ২)

প্রশান্ত বাবু তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র, অমিত বাবু, ভোলা বাবু এবং অরুণ বাবু দশম শ্রেণীতে – মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মাথায় চাপল পত্রিকা প্রকাশের ভূত। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, ওঁরা একদিন কথাটা মাস্টার মশাই শ্রী শ্রীকুমার ভাদুড়িকে জানালেন।
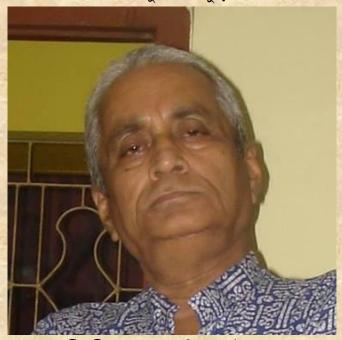
শ্রী শ্রীকুমার ভাদুড়ি (লাল্টু দা)

শ্রীকুমার বাবু সাঁত্রাগাছিতে 'লাল্টু' নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। সেই সুবাদে, মাস্টার মশাই হলেও, উনি ছিলেন এই চারজনের প্রিয় 'লাল্টুদা'। পত্রিকা প্রকাশের ভাবনাটা বিস্তারিত ভাবে যখন ওনাকে বলা হোল, সব শুনে, উনি এই চারজন কিশোরকে এগিয়ে যেতে প্রবল উৎসাহ দিলেন।

দূরের জানালা

শ্রীকুমার বাবু শুধু উৎসাহ দিয়েই থেমে থাকেননি, প্রশান্ত বাবুর কথামত, "আমরা তো ছিলাম, ছোটাছুটির জন্য, কিন্তু পুর পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন লাল্টুদা। এমন উৎসাহ দেবার মানুষ আমি জীবনে আর পাইনি। যে মানুষটা ভোর ছ'টায়, সাঁত্রাগাছি থেকে বেরিয়ে সুদূর কাচরাপাড়ায় অফিস যেতেন, তাঁর বাড়িতে আমরা কখনও কখনও রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত মিটিং করতাম। সে এক সময় ছিল... পুরো 'টিমটার 'মোরেল'টা এক্কেবারে বেঁধে রেখেছিলেন লাল্টুদা।"

অমিত বাবুর ভাষায়, "'গুঞ্জন' মানে লাল্টুদা, লাল্টুদা, লাল্টুদা... কিভাবে অ্যাডভারটাইসমেন্ট ফর্মটা ইংরাজিতে বানান হবে, সেখান থেকে শুরু করে, কাদের সাথে অ্যাডের জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে, কিভাবে গিয়ে কথা বলতে হবে... ইত্যাদি – সব কিছুই লাল্টুদা শিখিয়ে ছিলেন আমাদের। আমরা তখন অনেক কিছু লিখতাম সারা সপ্তাহ ধরে, প্রায় প্রত্যেক রবিবারই ওনার বাড়িতে আমাদের বসা হত, নিজেদের লেখাগুলো নিয়ে। কি করে লেখার মান আরও উন্নত করা যেতে পারে – সে বিষয়ে অনেক চর্চা চলত। (ততকালীন) সাম্প্রতিক পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলোর ছাপ কিভাবে লেখার মধ্যে আনা যায়, সে নিয়েও অনেক আলোচনা হত।"

আমরা আশা রাখি, পূর্বসূরিদের আশীর্বাদে এবং পাঠকদের সহ-যোগীতায়, আমরা আগামী দিনে 'গুঞ্জন'কে আরও অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।

বিনীতা

রাজশ্রী দত্ত – সম্পাদিকা

শরণ্যা মুখোপাধ্যায় – সহ-সম্পাদিকা ■

কলম হাতে

কলম হাতে

বর্ষার ইতিকথা

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

"কুলায় কাঁপিছে কাতর কপোত, দাদুরী ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে।"

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্রীষ্মের অগ্নিক্ষরা দহনে নিসর্গ প্রকৃতি যখন দগ্ধ নিরুদ্ধ-নিশ্বাস, আর তার তৃষ্ণাদীর্ণ বুকে যখন সুতীব্র হাহাকার; তখনই একসময় মেঘ-অম্বরে আবির্ভাব ঘটে ভৈরবী হরষে 'ঘন গৌরবে নব যৌবনা বর্ষা রানীর।' অরন্যসহ গ্রাম-শহর-নগর ও প্রান্তরে জাগে শিহরণের স্পর্শ। দিকে দিকে ওড়ে তার বিজয়-বৈজয়ন্তী। আকাশে দেখা যায় ধূসর পিঙ্গল কৃষ্ণঘন মেঘের সমারোহ। আর সাথে অবিরত শ্রাবণের ধারা আশীর্বাদের ন্যায় ঝরে পড়ে তপ্ত ভূমির বক্ষে। বর্ষা-কন্যার অঙ্গে সুসজ্জিত হয় কদম্ব-কেতকীর প্রাণবন্ত সুবাস।

শত শত যুগ ধরে বারিধারা শিল্পীকে দিয়েছে এক অনন্ত জগতের সন্ধান। আদি কবি বাল্মীকি তাঁর 'রামায়ণ' মহাকাব্যে 'অয়ং স কাল সমাগত' বলে বর্ষার যে অপরূপ বর্ণনা দিয়েছেন – তা বর্ণনাতীত। বর্ষার যে স্নিগ্ধ-সজল

বাংলা সাহিত্যে বর্ষা

মায়াময় ধারা যুগ যুগ ধরে কবি হৃদয়ে উদ্বেগ সঞ্চার করেছে। মহাকবি কালিদাসের দৃষ্টিতে ক্রীড়ারত হস্তীশাবকের ন্যায় আষাঢ়ের পুঞ্জ মেঘও পরিলক্ষিত হয়। কালিদাসের সেই বার্তাবাহী মেঘ আজও কবি ও পাঠক হৃদয়কে নিয়ে যায় সাহিত্য সৃষ্টির অলকাপুরীতে।

আবার জয়দেবের কাব্যে 'মেঘৈ-মেদুরম'এ বর্ষারই মৃদঙ্গ শ্রুত হয়। বৈষ্ণব কবি সজল বর্ষার গম্ভীর পরিবেশে পেয়েছেন দুশ্চর সাধনার সংকেত। মৈথিলি কোকিল বিদ্যাপতি তো শ্রীরাধাকে বর্ষা অভিসারী করে তুলেছেন – 'মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী / ফাটি যাও ত ছাতিয়া'। শ্রীরাধিকা 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর'এর শূন্যতার মাঝে করেছেন অনন্তের সন্ধান। মঙ্গলকাব্যের কবিরা বর্ষার এক দুঃখময় চিত্র অঙ্কন করেছেন। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম লিখেছেন – 'আছুক শস্য হেজ্যা গেল'। শুধু কাব্যে নয় সঙ্গীতেও বর্ষার এক আবেগপূর্ণ আবেদন রয়েছে। তাই কবিগুরুর লেখনীতে ফুটে ওঠে – 'শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা'।

বর্ষা-প্রকৃতিকে নিয়ে রচিত হয়েছে এবং আগামী দিনেও হবে কত গল্প, ছড়া, কবিতা, গান – তার ইয়ত্তা নেই। সেই জন্যই হয়তো বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন – "বাঙালির শ্রেষ্ঠ কবিতা বর্ষার কাব্য, বর্ষাকে অবলম্বন করেই বাঙালির প্রেমের কবিতা।" কারণ বর্ষার গহিনে যে রূপ, তার অন্তরের যে আকুতি – তা একজন কবি বা লেখক ছন্দ, লয়, উপমা বৈচিত্র্যে উপস্থাপিত করেন।

বাংলা সাহিত্যে বর্ষা

বর্ষা সত্যিই ঋতুকুল রানী সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে। তবে সেই বর্ষা রানী আজ কোনো এক রূপকথার মতো বিশ্ব উষ্ণায়ন নামক দৈত্যের কবলে বন্দি। সবুজায়নে ঘেরা রাজকুমার তরুরাজকে কারা যেন পাঠিয়েছে নির্বাসনে। এই সবুজ প্রকৃতির সাথে বারিধারার পুনর্মিলন ঘটলেই বিশ্ব মাঝারে ফিরবে শান্তি।

কবিগুরুর ভাষায়- **"বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি।"** ■

বিষাক্ত

মৌসুমী লাহিড়ী

ধূসর আকাশ
নীলের অভাব...
বিষাক্ত বাতাস,
কার্বনের প্রভাব।

উন্নয়ন অপরিসীম,
চেয়েছিল যারা...
বিশ্ব আজ কৃত্রিম,
দায়িত্ব এড়ায় তারা।

কি হবে সমাধান!
অপূরণীয় ক্ষতি...
নেই কোনো জ্ঞান,
শুধু নিজেদের স্তুতি। ■

বৃষ্টি

সরজিৎ কুমার মণ্ডল

বৃষ্টির খুব কাছে আসব বলেই গাড়ির ভেতর বসে আছি,
খোলামাঠে গাছেদের পাশে বৃষ্টিমুখর দিনে।

চারদিকে অগুনতি ফোঁটা ঝরে পড়ছে
ঝাপসা হয়ে...
জীবনটাও কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে...
চোখের জলও সে অস্পষ্টতাকে ছাপিয়ে দিচ্ছে।
হারিয়ে গিয়ে খুঁজে পাচ্ছি নিজেকে,
আর তাকে – যে আমাকে খুঁজে পেয়েছে,
আমাকে তার কীর্তির সাক্ষী করতে চেয়েছে। ■

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

নর্মদা পরিক্রমার ইচ্ছে নিয়ে অমরকণ্টকে এসে পৌছালাম দেওয়ালীর পরে। আমার সর্বক্ষণের সাথী কাকাজী আর ওমকারেশ্বরের স্বামী সরস্বতী দিব্যানন্দজীর সাথে। নর্মদা মন্দিরের প্রধান পুরোহিত নীলু মহারাজ আমাদের খুবই উৎসাহ দিলেন এবং যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। ৩১শে অক্টোবর ২০১৫ সালে পরিক্রমা শুরু করলাম। ইচ্ছা ছিল ভোরেই বেড়িয়ে পড়ি, কিন্তু প্রশাসনিক কিছু কাজকর্ম, আমাদের পরিচয় পত্র ইত্যাদি তৈরি হতে দেরি হওয়ার জন্য বেড়োতে বেড়োতে দুপুর হয়ে গেলো।

মা নর্মদাকে প্রণাম করে জলধারাকে ডানদিকে রেখে অর্থাৎ দক্ষিণতট ধরে এগিয়ে চলেছি। এরোণ্ডী, চক্রতীর্থ হয়ে কপিলধারায় এলাম। অত্যন্ত চড়াই পথ ধরে ওপরে উঠে এলাম জঙ্গলের মধ্যে। বেশ গভীর জঙ্গল। জঙ্গলের গভীরতা সম্পর্কে কোনো ধারনা না থাকার জন্য মনের মধ্যে বেশ ভয় এলো। শীতের সময় জঙ্গলের মধ্যে শীতটা একটু বেশিই লাগে। তার ওপরে বেলা ছোটো হয়ে এসেছে তাই রাতের আশ্রয় চাই। বুঝতে পারছিলাম না কি হবে, দিব্যানন্দজী ভরসা দিলেন – এখানে অনেক সাধুর কুটির আছে,

নমামি দেবী নর্মদে

একটা না একটা ব্যবস্থা হবেই। কিছুটা এগিয়ে দেখলাম নর্মদার জলধারা পাঁচ ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এখানে একটা ছোটো সাধুর কুটির দেখতে পেলাম। কাছে গিয়ে নর্মদে হর বলতেই উনি বেড়িয়ে এসে আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। জানতে চাইলাম জায়গাটির নাম কি কপিলধারা? উনি বললেন – না, এই জায়গাটির নাম পঞ্চধারা। উত্তর পাড়ে আরো একটি সাধুর কুটির আছে এবং এই কুটির থেকে আরো কিছুটা দূরে একটি পরিত্যক্ত সাধুর কুটিরও লক্ষ্য করলাম।

প্রচণ্ড শীত, আর তার সাথে ঠাণ্ডা বাতাস। তাই বাইরে বেশিক্ষন না থেকে মহারাজজী তাঁর ধুনির পাশে আমাদের বসতে বললেন। সাধুটির নাম রামজী মহারাজ। উনি আমাদের রাতের ভোজন প্রসাদ তৈরি করতে লেগে পড়লেন। গরম চা শেষ হতে না হতেই ওনার খিচুরি রান্না প্রায় শেষ হয়ে এলো। সময় নষ্ট না করে, সন্ধ্যারতি করার পর ভোজন প্রসাদ গ্রহণ করে শুয়ে পড়লাম।

...ক্রমশ ■

सबिंदु सिन्धु सुस्खल तरंग भंग रंजितम
द्विषत्सु पाप जात जात कारि वारि संयुतम।
कृतान्त दूत काल भुत भीति हारि वर्मदे
त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।।

অন্তর্দহন

অনির্বাণ বিশ্বাস

তুমি দাবানল দেখেছো?
কিংবা দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা কোনো গাছকে?
আগুনের লেলিহান শিখার লোলার্ত জিহ্বা কিভাবে
গ্রাস করে তিলতিল করে গড়ে ওঠা তার সবুজ সংসার!

তুমি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া কোনো পোকাকে জ্বলতে
দেখেছ?
জ্বলবে জেনেও তার উন্মত্ত সমর্পণ।

দেখেছ কখনো
কষাইয়ের দোকানে কাঁপতে থাকা অসহায় বন্দী প্রাণীর
ভুরিভোজের মাঝে –
করুণ দু'চোখ বেয়ে নামতে থাকা অশ্রুর ধারা?

জোকারের পুঞ্জীভূত দুঃখ-যন্ত্রণার হিসাব নিয়েছ কি?
সেটা লেখা আছে ঐ তার 'মেক-আপ'এর প্রতিটি
প্রলেপের আড়ালে।

চেতনা

ভিতর ভিতর জ্বলতে থাকা,
পুড়তে থাকা,
দগ্ধ মানুষের হাসিমুখের মিছিল —
কখনো কি অনুভব করেছ?
তিলে তিলে শরীরের সমস্ত প্রান্তে
ছড়িয়ে পড়ে জ্বলন...
ক্যান্সারের মতো নষ্ট হয় যত
প্রেম-আবেগ-স্নেহ-মমতা...
ঝাঁঝরা হোয়ে, ফোঁপলা হোয়ে,
ধীরে ধীরে
প্রতিটি মানুষ পরিণত হয়
এক জীবন্ত লাশে।

মরণ!!!!
সেও তো ভালো...
যবনিকা সমস্ত কর্মের।
কিন্তু মনের সর্পদংশনে
গ্যাংগলিয়া হয়ে
নিজেকে নিজেই ক্রমশ গ্রাস
করা ????
হয়তো অন্তর্দহন –
কোনো অজানা গরল-আবর্তে !!!

■

ভ্রমণ কাহিনী

ডেসার্ট ট্রায়াঙ্গল

(যোধপুর পর্ব)

মালা মুখার্জী

শীতের হিমেল হাওয়ার স্পর্শে, কুয়াশা ঘেরা সকালে দিল্লীতে যখন দুহাত দূরের জিনিস দেখতে পাওয়া প্রায় অসম্ভব, তখন ড্রাইভ করে রোজ অফিস যাওয়ার হাত থেকে রেহাই পেতে, দিয়ে দিলাম এক সপ্তাহের ছুটির দরখাস্ত । মনে মনে ভেবেও নিলাম কি করবো ।

অনেকদিন ধরেই মরুশহর দেখার ইচ্ছা থাকলেও, কলকাতা থেকে রাজস্থান যেহেতু বেশ দূর আর অনেকদিন ধরে ঘুরতে হয় বলে, ছোটবেলায় এ ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। এখন দিল্লীতে কাজের সুবাদে রাজস্থান তো পাশের বাড়ী। আর ইন্টারনেটের দৌলতে এখন কিছু জানা বা বুকিং করা শক্ত নয়, তাই ঝটাপট আর টি ডি সি মানে রাজস্থান ট্যুরিজিমের হোটেলে ঘর বুক করে ফেললাম।

দিল্লী থেকে রাজস্থানের ট্রেনে বুকিং পাওয়া শক্ত নয়, যদি না তা নাইট জার্নি হয়। তাই যোধপুর অবধি চুরু স্পেশাল ট্রেনের বুকিং করে ফেলতে অসুবিধা হল না। এসব

ট্রেনে তো কেউ রিজার্ভ করে টু টিয়ারে চড়ে না! প্ল্যানটা এমন হল যে যোধপুর দেখে, জয়শলমীর যাবো, ওখান থেকে বিকানীর, তারপর ব্যাক টু দিল্লী। জয়শলমীরের ট্রেনে ভীড় থাকায়, আর সঙ্গে সিনিয়র সিটিজেন থাকায়, রিস্ক না নিয়ে রেড বাসের অ্যাপস্ থেকে বাস টিকিট কেটে নিলাম। ব্যস্, যাত্রার সব আয়োজন সম্পূর্ণ।

বুধবার তেরোই ডিসেম্বর টিকিট কেটে, ষোলই ডিসেম্বর শনিবারে রাজস্থানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ার সৌভাগ্য কলকাতা থেকে হওয়া সম্ভব ছিল না। দূরে বেড়াতে যাওয়া মানেই হল মাস-চারেক আগে থেকে তোড়জোড়। আমাদের ছোটোবেলায় তো সেই কয়লাঘাটা থেকে টিকিট কিনতে হত।

যাই হোক, এক কুয়াশা ঘন ভোরে মা-মেয়েতে গাড়ী করে বেরিয়ে পড়লাম হজরত নিজামুদ্দিন স্টেশনের উদ্দেশ্যে। চেনা গাড়ীওলা ওখানে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলে, শুরু হল এক অন্তহীন অপেক্ষা। সকাল সাতটার গাড়ি ন'টার আগে এল না, টানা দু'ঘন্টা লেট। মানে যোধপুর যেতে বেশ রাত হবে! সেটা কোনো বড় ব্যাপার নয়, আসলে আর টি ডি সি রাত দশটার পর ডিনার দেয় না, এটাই চিন্তার! ট্রেনেতে দু টিয়ারে বেশ জানলা দেখতে দেখতে টাইম চলে গেলেও, কারো সাথে কথা বলার বিশেষ অবকাশ নেই, কারণ এনারা ট্যুরিষ্ট নন, কাজের জন্য যাতায়াত করা স্থানীয় মানুষ, মূলত বিসনেজম্যান।

ভ্রমণ কাহিনী

এঁরা বেশ অবাকই হলেন দুজন মহিলাকে নিছক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরোতে দেখে। এঁদের কেউ কেউ যোধপুরের বাসিন্দা হলেও মেহেরণগড় ফোর্ট দেখার দরকার বোধ করেননি কখনো। আমার কাছে যোধপুর আরও একটা কারণে বিখ্যাত, এখান থেকেই জটায়ু ফেলুদার দলে ভেড়েন, আর যোধপুরের দোকানে সোনার পাথর বাটি দেখেই মুকুলের সোনার কেল্লা যে জয়শলমীরে তা বোঝা যায়। অর্থাৎ এই রুটে একটা ফেলুদা ফেলুদা গন্ধ। তাই জয়শলমীরের আগে যোধপুর মাস্ট।

দিল্লীতে কুয়াশা থাকলেও রাজস্থানের আকাশ রৌদ্রজ্জ্বল থাকায় ট্রেন আর বেশী লেট করতে পারেনি। ট্যুরিজিমের হোটেলগুলি স্টেশনের কাছেই হওয়ার সুবাদে দশটার মধ্যেই ঢুকে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। পরের দিনটা যোধপুর ভ্রমণের জন্য রেখে ছিলাম। অতীতের মাড়োয়ার সাম্রাজ্যের 'আন বান শান' এখনো মেহেরণগড় দুর্গ তার বুকে সযত্নে আগলে রেখেছে ।

ট্রেন বেশ রাতেই যোধপুরে পৌঁছল, বেশ তড়িঘড়ি নামতে হলো, কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই ইন্টারসিটির নাম নিয়ে ইনি বিকানিরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। যোধপুরে অটো পেতে অসুবিধে হল না, খুব সহজেই হোটেলে পৌঁছে দিল আর হোটেলে গিয়েই রুম নেওয়ার আগেই করলাম সাইট সিনের বুকিং। দেরি করে ফেলায় বাসে জায়গা

মিলল না, গাড়ী নিতে হল। আর এক ঘন্টা লেট হলে গাড়ীও পেতাম না, কারণ শীতে এখানে খুব লোক হয়।

যোধপুরে দেখার অনেক কিছুই আছে। তবে সিটি ট্যুরের জন্য আর টি ডি সির বাস নিলে খরচ কম, নয়তো গাড়ী পুরো তিন হাজার। প্রথমেই বলি মেহেরণগড় ফোর্টের কথা, ভারতের সবচেয়ে বড় ফোর্ট এটা। রাঠোর সিংহ রাও যোধা ১৪৫৯ সালে দুর্গটি নির্মান করেন একটি আগ্নেয়শিলার ওপর (volcanic rock)। রাঠোরদের আদি রাজধানী মাণ্ডোর ছেড়ে এখানে নতুন দুর্গ বানানোর উদ্দেশ্য, পশ্চিম থেকে আসা ক্রমাগত বিদেশী আক্রমণকে প্রতিহত করা ।

রাজস্থানের সব জায়গার মতো এ জায়গারও ইতিহাস যুদ্ধবিগ্রহের। মাণ্ডোরের যুবরাজ রাও যোধা ৪১০ ফিট ওপরে এই পাহাড়ে মেহেরণগড় বা মিহিরগড় দুর্গ নির্মান করেন (১৪৫৯ সালে)। শোনা যায় পরম সাধ্বী শ্রী কার্ণিমাতা এ দুর্গের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। বিকানীর আর যোধপুর দুটি দুর্গই তাঁর আশিস প্রাপ্ত, কারণ দুটি রাজ্যই পরস্পরের জ্ঞাতিরাজ্য। অবশ্য কোনো সাধু যাঁর নাম চিড়িয়াবাবা তিনি নাকি অভিশাপ দিয়েছিলেন যে দুর্গে সর্বদাই জলকষ্ট থাকবে। আসলে ওই জায়গায় তাঁর আশ্রম ছিল। সাধুর অভিশাপ কাটাতেই এসেছিলেন কার্ণিমাতা, এই সাধ্বীর মহিমা আরও বলব জয়শলমীর ও বিকানীর পর্বে।

এই দুর্গের সাতটি তোরণ বা পুল। ফতেপুল আর বিজয়পুল যেমন রাণা অজিত সিংহ আর মান সিংহের বিজয়

অভিযানের স্মারক, তেমনই লোহাপুল রাজপুত রমণীদের জহরব্রতের স্মারক। লোহাপুলের দেওয়ালে অসংখ্য হাতের ছাপের সামনে দাঁড়িয়ে অডিও গাইডের বোতাম টিপতেই শুনতে পেলাম সেই করুন কাহিনী। এখানে দু'ট কাহিনী আছে। প্রথম কাহিনী রাজা অজিত সিংহের, যিনি ১৭২৪ সালে যুদ্ধে পরাজিত হন, তাঁর ছয় রাণী আর তাঁদের আটান্নজন সহচরী বা পুরনারীরা জহর করেন। নববধূর বেশে শেষবারের মতো জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দেওয়ার আগে রেখে যান হাতের ছাপ।

আর দ্বিতীয় কাহিনীটি হলো রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর। উদয়পুরের মেবারবংশের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারী রাজা ভীমসিংহের কন্যা ছিলেন, অপূর্ব রূপবতী এই রাজকুমারীর পাণিগ্রহন নিয়ে জয়পুর আর যোধপুরের মধ্যে বাঁধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, এরই সাথে যোগ দেন মারাঠা রাজারাও। হতভাগ্য এই কন্যা ছিলেন মারওয়াড়ের রাজা ভীম সিংহের বাগদত্তা, কিন্তু ভীমসিংহের মৃত্যু হলে তাঁর খুড়তুতো ভাই মানসিংহ রাজা হন ও মেবারের রাজকন্যাকে বিবাহ করতে চান।

মানসিংহকে মারওয়াড়ের অধীশ্বর মানতে নারাজ মেবারপতি ভীমসিংহ (কৃষ্ণকুমারীর পিতা মেবার রাজের নামও ভীম সিংহ), মানকে সিংহাসনচ্যুত করতে সন্ধি করেন জয়পুরের সাথে। জয়পুরেই বিয়ের ঠিক হয় কৃষ্ণকুমারীর। মানসিংহ মারাঠা সর্দার সিন্ধিয়া আর হোলকারের সহায়তা চান।

দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পতন ডেকে আনে যোধপুরের। যোধপুরের রাজা মানসিংহের পতন হলে শুধুমাত্র তাঁর রাণীরাই সতী হননি, কৃষ্ণকুমারীও যুদ্ধ থামানোর জন্য করেন বিষপান। ১৮১০ সালে হওয়া তাঁর এই করুণ মৃত্যুর খবর সুদূর ইংল্যাণ্ডেও পৌঁছে ছিল। তবে এই রাজনৈতিক বিবাহে কৃষ্ণকুমারীর মত অজানাই থেকে যায়।

এসব কাহিনী নিঃসন্দেহে গায়ে কাঁটা দেয়, চোখে জলও আনে আর নতুন করে চেনায় রাজস্থানের ইতিহাসকে।

মেহেরণগড় ফোর্টের সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হলো লিফ্ট, যা বয়স্কদেরও দুর্গ দেখার সুযোগ করে দেবে। লিফ্টে ওঠা যায়, আবার বেশী বয়স্কদের নামিয়েও দেয়, কর্মচারীরাও খুব ভাল। আজকাল অডিও গাইড পাওয়া যায়, তাই নিজে নিজেই সব দেখা যায়। দুর্গের ভিতর হাওদা, পাল্কি, দোলনা, সিংহাসন, অস্ত্র, রাজবেশ এসব দেখতে দেখতে কখন যে সারা দুর্গটা ঘোরা হয়ে যায় কেউ বোঝে না, দুর্গ শেষ হয় দেবী চামুণ্ডার মন্দিরে, ইনি রাঠোরদের কুলদেবী। দুর্গের ছাদের ওপর থেকে নীচে শহরটিকে দেখে চমকে উঠলাম, যেন নীলের ঢেউ। এইজন্যই যোধপুরকে ব্লু সিটি বলে।

এরপর যশোবন্ত থাডা আর প্যালেস অবশ্যই দর্শনীয়। রাজা যশবন্ত সিংহের স্মৃতিতে তাঁর পুত্র ১৮৯৯ সালে এই সুন্দর ছত্রীটি বানান। এর পাশে বিরাট তালাও (lake)। আশা করি চিড়িয়াবাবার কথা পাঠকগণ ভোলেননি। পাখিদের নিয়েই

ছিল তাঁর সংসার। মাণ্ডোরের রাজারা তাঁকে স্থানচ্যুত করলেও এখানেই বানিয়ে দেন নতুন আশ্রম। আজও নিয়ম করে এই তালাওতে আসে দেশবিদেশের পাখিরা, বিশেষত শীতকালে। একটি সাইবেরিয়ান হাঁসকে অনেকক্ষণ ধরে তাক করে থেকে ক্যামেরা বন্দী করলাম। নীল আকাশ, নীল জলের মাঝে কালো পাথরে বসা সাদা পাখিটির ছবি সব কিছুর চেয়ে দুর্লভ মনে হলো।
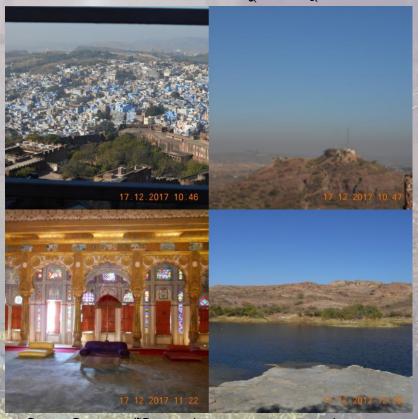
চিত্র পরিচয়ঃ (বাঁদিকের উপর থেকে ক্লকওয়াইজ) ক) নীলশহর যোধপুর, খ) দুর থেকে মেহেরণগড় ফোর্ট, গ) সেই তালাও (lake) এবং ঘ) ফোর্টের রাজদরবার...

"ড্রাইভার ঔর ক্যায়া হ্যায়?"

"আরে ম্যাডামজী, আভি তো উমেদ ভবন প্যালেসই বাঁচা হ্যায়...." – ড্রাইভার আমার অজ্ঞতায় হেসে ফেলে। আসলে মেহেরণগড় দেখে বেশ ক্লান্ত লাগছিল, যতই হোক পৃথুলা শরীর। গাড়ী উমেদভবনে গেল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য স্থাপত্য শিল্পের মেলবন্ধনে তৈরী উমেদভবনে তিনশতরও বেশী কক্ষ, এখানেই থাকেন এখনকার রাজপরিবার। প্রাসাদের এক অংশ হোটেল ও এক অংশ মিউজিয়ম। মিউজিয়মে আছে দামী দামী বিদেশী দ্রব্য – বিশেষত বিভিন্ন রকমের ঘড়ি, সেন্টের বোতলের সমাহার, আর দুর্লভ ফোটোর সম্ভার। এখানে মধ্যযুগের ইতিহাস নয়, আধুনিক যুগই বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। ড্রাইভার গর্বের সাথে প্রাসাদের দিকে দেখিয়ে বলল, "আমরা বংশানুক্রমে যাঁর প্রজা, তিনি এখানেই থাকেন।"

এরপরের গন্তব্য ছিল মাণ্ডোর গার্ডেন। আগেই বলেছি মাণ্ডোর ছিল মারওয়ড়ের পুরনো রাজধানী। মাণ্ডোর গার্ডেনে পুরাতত্ত্বের সম্ভার, তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মন্দির, মিউজিয়ম আর বাগান ছাড়াও আছে অসংখ্য বাঁদর, তবে তারই মধ্যে লোকজন পিকনিকও করছে। মাণ্ডোর উদ্যান দেখার পর ফিরে চললাম হোটেল ঘুমরে। হাতে একদিন সময় থাকলে বিষনোয় ভিলেজ যাওয়া যায়, পথে দেখা হয়ে যাবে এক টুকরো মরুভূমি ও লুনী নদীর সাথে।

এই গ্রামে হাতের কাজ অবশ্যই কিনতে হবে, কম্বল, শাড়ী এসব বেশ সস্তা। যোধপুরের আশেপাশে পালি, খিমসর, ওশিয়ন এসবও আছে, তবে এগুলো জয়শলমীরের পথেই দেখা যায়।

...ক্রমশ ■
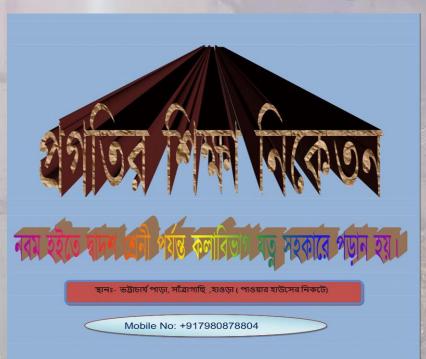
বর্ষাতে

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

জানালার কাচে জলের ঝাপটা,
বাইরে বর্ষার ঘনঘটা...
যেদিকে তাকাই মেঘেদের নাচানাচি,
তারা যেন আজ বড় কাছাকাছি।

সড়কের ওপারে হাইড্রেন উপচে জল।
রাস্তায় গাড়ী, নাকি স্টীমারের চলাচল!
ফ্লাইওভারের নীচে এক বিধ্বস্ত সভ্যতা...
এটাই আজকের শহরের বাস্তবতা।

যদি ওই জলে ভেসে যায়
কিছু অপূর্ণ মানুষের অভিপ্রায়,
উচ্ছিষ্ট বলে যারা শহরের বোঝা
তাদের কি হবে ধুম করে খোঁজা?

ওই মানুষগুলোর সম্মুখে উদ্বেগ
অথচ আমার স্কাই স্ক্রেপার ছোঁয়া মেঘ...
মেঘ ছুঁতে চেয়েছিলাম পঁচিশ বছর আগে
তবু আজও কোথায় যেন বিষাদ বীণা বাজে... ■

ঋতু কাহিনী

বর্ষা

ওমর ফারুক চৌধুরী

খরায় জমি চৌচির, বাতাসে অগ্নি,
তরু লতার আহ্বান,
যেন চাতকের চাহনি।
আসছে বর্ষা –
পেরিয়ে চৈতালী, ঝোড়ো বৈশাখী,
আর টর্নেডো, ঘূর্ণি।
আষাঢ়ে সে অঝোর ধারায় ঝরে;
চৈত্র, বৈশাখে ডেকেছিলে তারে
মনে পড়ে?

\## ## ## ##

অতিষ্ঠ গরমে গা জুড়াব
এসেছি তোমাদের দুয়ারে,
ঢেলেছি জল – পুকুর, জলাশয়, নদ-নদী,
সাগরের ঘরে।
জমিনে আনিব বান, চলে যেতে যেতে
নৌকো, ভেলা পারাপারে
রবে সারাবেলা মেতে।

ঋতু কাহিনী

যেদিকেই দেখবে শুধু জল থৈ থৈ,
দুষিওনা মোরে,
আমার ধর্মই হলো জলে হৈ হৈ।
বিরাজি ষড়ঋতুর পরিবারে।
তেজষী আষাঢ়ের সাজে,
আসিব বারে বারে।

ফিরে যাবো আবার আপনালয়ে...
শাওন-ভাদর পরে, ঝিলিক চমকিয়ে
গগনে বাজবে না বজ্রের গুড়ুম গুড়ুম সুর,
শুনবেনা রিমিঝিমি বৃষ্টির শব্দ সুমধুর।
ভিজে যাবেনা আর আচমকা কোন ঝড়ে।
বছরের বলয়ে বিদায় নেবো
আমার জল, ঝড়-তুফানের স্মৃতি মেখে,
অপরূপের এই দেশে তোমরা রইবে সুখে। ■

ছায়া-কায়া

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

(৩)

রঞ্জনার সেই ফেলে আসা দিনগুলোর স্বপ্নের ঘোর ভাঙল ভোলাদার কণ্ঠস্বরে:

— রঞ্জনা বউদি, শিগগিরি চলুন বাবু ঘরের ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে কিছুতেই খুলছেন না। আমাকে শুধু বলছে রঞ্জনাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলো ভোলাদা। নাহলে আমি এ দরজা আর কোন দিনও খুলব না।

রঞ্জনা ছুটে যায় জয়ের ঘরের কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করে কিন্তু জয় তার ঘরের দরজা খুলতে একবারেই নারাজ। মনের সাথে সাথে জয়ের সাথে সংসার করার দরজাটাও আজ বন্ধ হয়ে গেল রঞ্জনার কাছে। জয়ের সব দায়িত্ব ভোলাদাকে বুঝিয়ে দিয়ে সেই দিনই ওই ঝড়-জল মাথায় নিয়ে রঞ্জনা তার বাপের বাড়ি চলে যায়।

— হল তো বউটাকে তাড়িয়ে শান্তি পেয়েছো? বাপের জন্মে তোমাকে আঁকতে দেখিনি। এখন বড় শিল্পী হয়েছো?

— ভোলাদা তুমি এখন নিজের কাজ করো, আমাকে একটু একা থাকতে দাও। বড়ো ক্লান্ত লাগছে।

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

জয় তার দুই হাত দিয়ে চাকাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জানলার কাছে গিয়ে হুইল চেয়ারটা থামাল। তারপর জানলার পাল্লা দুটো বন্ধ করে, পুনরায় টেবিলের পাশে এসে পেনসিলটা নিয়ে আবার আঁকতে শুরু করল।

(৪)

বাপ-মা মরা একমাত্র ভাগ্নির করুন মুখটার দিকে তাকাতে পারছিলেন না সুধীরবাবু। এই ভাগ্নি ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। সুধীরবাবু রঞ্জনার ঘরে ঢুকে বললেন – কিরে? কখন থেকে তোর ফোনটা বেজে যাচ্ছে, তুলছিস না কেন? দাঁড়া আমি তুলছি।

– হ্যালো

– আমি ভোলা বলছি, বউদিমনিকে ফোনটা দিন। সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে দাদাবাবু ঘরে নেই। এই এতো রাতে কার সাথে কোথায় গেলেন?...

– সেকি? কি বলছ? জয় তো হাঁটতে পারে না। ও কার সাথে বাইরে যাবে? কেউ কি এসেছিল?

– না। আমি খাইয়ে দিয়ে সব কাজ সেরে ঘুমাতে চলে যাই। হঠাৎ ঘুম ভাঙতে দেখি সদর দরজা খোলা আর দাদাবাবু ঘরে নেই।

– তুমি বাড়ির এদিক-ওদিকটা দেখেছো? আমরা এখনি আসছি।

ফোনটা রেখে সুধীরবাবু বললেন – রঞ্জনা শিগগিরি ওঠ, জয়কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখনি আমাদের বেরোতে হবে, আর হ্যাঁ প্রয়োজন পড়লে পুলিশের সাহায্য নিতে হবে।

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

ছেলেটা হাঁটতে পারে না। কে ওকে এতো রাতে নিয়ে গেলো? নিশ্চয়-ই ওই কোচ মহেশ রায়ের আবার কোনো নতুন চাল।

রঞ্জনা পাথরের মূর্তির মতো একই ভাবে বসে রইল। নির্বিকার ও নিশ্চুপ।

— ওরে রঞ্জনা ওঠ মা, এখন এতো অভিমান নিয়ে থাকার সময় নয়। চল চল তাড়াতাড়ি।

স্মিত স্বরে রঞ্জনা বলল — কোথাও যেতে হবে না। সকালে ওকে আবার ওর ঘরেই পেয়ে যাবে।

সুধীরবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন — কি বলছিস ? কিছুই বুঝলাম না?

রঞ্জনা অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগল। সুধীরবাবু তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন — মা আমাকে বল কি হয়েছে? কি সমস্যা তোদের মধ্যে? ...ক্রমশ ■

বান্ধবী

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস

মানুষ যখন তাহার আগাইবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে তখনই সে গরুর জাবর কাটার ন্যায় স্মৃতি হাতরাইয়া আনন্দ পায়। ইহাতে অনেক সময়ই উত্তরসূরিরা লাভবানই হন। সুকমলও ইহার ব্যতিক্রমী নহে। সরকারী চাকুরি হইতে সে বহুদিন হইলো অবসর লইয়াছে। একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়াছে তাও আজ বছর দুই হইল। স্বামী স্ত্রীর সংসার। স্ত্রী সর্বক্ষণ নিজ সংসার লইয়া ব্যস্ত থাকে। সন্ধ্যায় মহল্লার আরো সকল গৃহিনী একত্রিত হইয়া হাঁটিতে বাহির হয়। হাঁটা যত না হয় তাহা হইতে কূটকাচালী কিঞ্চিৎ বেশীই হয়। গরম বেশ পরিয়াছে। সুকমল আজ বৈকালে হাঁটিতে হাঁটিতে ব্রতচারী গ্রামের বিদ্যাশ্রমের পুকুর পাড়ের আম গাছটির নীচে গিয়া বসিল। সেই শৈশব হইতেই এই জায়গাখানি তাহার বড় প্রিয়। পুকুরের শীতল বাতাসে সে নিজেকে হারাইয়া ফেলিল। বিদ্যাশ্রমের মাঠে বিদ্যালয়ের বালক বালিকাগণের দৌড়ঝাপ দেখিয়া নিজের শৈশব আর কৈশোরেরর স্মৃতির জাবর কাটিতে লাগিল। আমি তাহার পাশে বসিয়া শুনিতে লাগিলাম সেই মধু মিশ্রিত কাহিনী।

চিরাচরিত

মিত্র বংশের প্রথম নাতি হইবার সুবাদে উত্তরবঙ্গের মাতুলালয়ে আদরে তাহার বাড়িয়া ওঠা। চতুর্থ শ্রেণীর বৃত্তি পাশ করিবার পর মা লইয়া আসিলেন নিজের কাছে। নুতন স্কুল, নুতন বন্ধু বান্ধব, বিশাল বিশাল গাছের মধ্য বিদ্যালয়টি কেমন যেন হারাইয়া গিয়াছে। এক অপূর্ব আশ্রমিক পরিবেশ। কখনো শ্রেণী কক্ষে কখনো বা গাছের নিচে মাষ্টার মহাশয়গণ ছাত্র ছাত্রীদের লইয়া ক্লাশ পরিচালনা করেন। সকলে মিলিয়া বিদ্যালয় পরিস্কার করে, গাছ লাগায়, জল দেয়। ছোট হইতেই এ বিদ্যালয় 'একান্তই আমার' এই মনোভাব গড়িয়া তুলিবার জন্য সমস্ত শিক্ষক মহাশয়দের কি অক্লান্ত প্রয়াশ। বিদ্যালয় ছুটি হইবার পর ছাত্রদের সাথে শিক্ষক মহাশয়গন একসাথে ফুটবল, ক্রিকেট খেলেন। মাষ্টার মহাশয়গণ শ্রেণীকক্ষে যাহা পড়ান তাহার বাহিরে বাড়ীর পড়া হিসাবে দেন রোজ দুইপাতা করিয়া ইংরাজী আর বাংলা হাতের লেখা, গোটা দশেক অঙ্ক আর ট্রানস্লেশন। গতানুগতিক বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল আর যাহা থাকে তাহা শ্রেণী কক্ষেই তৈয়ারী হইয়া যায়। বিদ্যালয় ছুটির পর স্কুলের বিশাল মাঠে দৌড়াদৌড়ি করিয়া কিংবা স্কুলের গাছে চড়িয়া ছোটরা খেলা করে। সন্ধ্যার শাঁখ বাজিবার পূর্বেই বাড়ী ফিরিয়া হারিকেন জ্বালাইয়া পড়িতে বসা। দুইটি বছর কাটিয়া গেল, সপ্তম শ্রেণীতে আসিয়া ভর্তি হইলো নুতন ছাত্রী, শুক্লা। শ্রেণীতে সে সক্কলের চাইতে লম্বা,

উজ্বল শ্যামবর্ণ, গজদন্তী, মুখখানি ভারী মিষ্টি। প্রথম দিন বিদ্যালয়ে আসিয়াই তাহার সুকমলের সহিত ভাব জমিয়া গেল। মনে হইলো সে যেন অনেক পূর্বেই সুকমলকে চিনিত।

সেই বৎসর দুর্গাপূজার ছুটির পর শ্রেণী কক্ষে বন্ধুদের সাথে মারামারি করিতে করিতে সুকমল লাইব্রেরীর একখানি পুস্তকের পাতা ছিড়িয়া ফেলিয়াছিল। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক মহাশয় আসিয়াই ছেঁড়া পুস্তকখানি দেখিয়া অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। কে এমন কর্ম করিয়াছে তাহা জানিতে চাহিলেন। সকল ছাত্র ছাত্রীগণ মাথা নত করিয়া বসিয়া আছে। ধীরে ধীরে শুক্লা উঠিয়া কহিল হাতে লইয়া দেখিতে গিয়া হাত হইতে পরিয়া গিয়া পাতা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। মাষ্টার মহাশয় গায়ে হাত দিলেন না বটে তবে গোটা পিরিয়ডটাই তাহাকে দাঁড় করাইয়া রাখিলেন। ছুটির ঘন্টা বাজিলে সকল ছাত্রছাত্রী শ্রেণী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল, সুকমল জিজ্ঞাসা করিল, মিথ্যা কথা কহিলে কেন? শুক্লা চটপট উত্তর দিল, তাহা না হইলে শিক্ষক মহাশয় তাহার বাড়ি গাছ খানি তোমার পিঠে ভাঙ্গিতেন। সুকমল মাথা নিচু করিয়া ধীর পায়ে শ্রেণীকক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। সুকমলের মনে হইল তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য মা বাবার পরেও কেহ আছে। কৈশোরের দিনগুলি ছোট হইয়া আসিতেছে অনেক কিছুই লুকাইয়া রাখিতে মন চায়। একমাত্র ভরসা

শুক্লা। সুকমল তাহার সব কিছুই শুক্লাকে বলিতে দ্বিধা করে না। সুকমল জানিয়া ছিল শুক্লার মা বাবা গত হইয়াছেন, সে তাহার দিদি জামাইবাবুর বাসায় থাকিয়া পড়াশোনা করে।

তখন টিফিনে প্রতি শ্রেণীতে চারটি করিয়া বিস্কুট দেওয়া হইতো। একদিন ক্লাসে দুষ্টুমি করিবার অপরাধে সুকমলের টিফিন বন্ধ হইলো। টিফিন পিরিয়ড শেষ হইতেই শুক্লা সবার অলক্ষ্যে সুকমলের হাতে দুইটি বিস্কুট গুজিয়া দিল। সুকমল আস্তে করিয়া কহিল, তোর ক্ষিদে পাবে না? শুক্লা ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল 'না'। সুকমলও প্রায়ই কাঁচা আম, পেয়ারা, জাম, গোলাপ জাম, যখন যা পায় পকেটে করিয়া লইয়া আসে, চুপি চুপি শুক্লার হাতে গুঁজিয়া দেয়। শুক্লাও তাহার টিফিনের দুইটি বিস্কুট সুকমলের জন্য তুলিয়া রাখে। স্কুলের রবীন্দ্র জয়ন্তীতে দুইজনে এক সাথে অভিনয় করে। এমনি করিয়াই এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উত্তরণ। দুইজন দুইজনকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। সেইবার দশম শ্রেণীর পরীক্ষার কিছু আগে হইতে সুকমল বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করিল। খোঁজ লইয়া জানা গেল সে ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। শুক্লা দুইবেলা সুকমলের বাড়ীতে গিয়া তাহার মাথার কাছে বসিয়া জোরে জোরে পড়িয়া শোনায় ও তাহার সেবা করে। পরীক্ষার পূর্বেই সে সুস্থ হইয়া উঠিল। যথা সময়ে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা হইয়া গেল। আগামী তিন মাস ছুটি। এখন তাহার শুক্লার সাথে দেখা হয় কম কিন্তু যখনই

দেখা হয় তখনই আগামী দিনেতে কি পড়িবে এবং ভবিষৎ এর পরিকল্পনা লইয়া নানা কথা হয়। এমনি করিয়া চলিতে চলিতে একদিন পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইলো। সুকমল ভালো ফল করিয়া কলিকাতায় পড়া মনস্থ করিলো। শুক্লা চোখের জলে তাহাকে বিদায় জানাইলো। সুকমল ট্রেনে করিয়া চলিতেছে, সামনে নুতনের আহ্বান, কিন্তু মন পড়িয়া রহিয়াছে শুক্লার নিকট।

শহর কলিকাতায় আসিয়া প্রথম প্রথম সে শুক্লাকে পত্র লিখিত ক্রমে তাহা কমিতে লাগিল। নুতন বন্ধু বান্ধব, শহরের নানান মনোরঞ্জক অনুষ্ঠান, পড়ার চাপ ইত্যাদির মাঝে শুক্লার গুরুত্ব কমিতে লাগিল। মাঝে শুক্লা তাহাকে চিঠি লিখিয়া ছিল। তাহাতে মনের কিছু বেদনা ছিল এবং সর্বশেষে ছোট করিয়া তাহাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছিল। সুকমল পত্রখানি হাতে পাইয়া খুব একটা গুরুত্ব দেয় নাই। শুধু শুক্লার অদ্ভূত প্রস্তাব দেখিয়া মনে মনে হাসিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে দুইটি বছর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। সুকমল এখন পূর্ণ যুবক। সেই বৎসর সরস্বতী পূজার সময় সে গ্রামে আসিয়া বন্ধুদের সাথে মাতিয়া গেল। ঠিক করিল বৈকালে গিয়া একবার শুক্লার সাথে দেখা করিয়া আসিবে। অনেকদিন পরে সে কলিকাতা হইতে পকেটে করিয়া শুক্লার জন্য কিছু চকলেট আনিয়া ছিল তাহা লইয়া শুক্লার সহিত দেখা করিতে গেল। শুক্লার দিদি দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া

আনন্দে আগাইয়া আসিলেন। তাহার সুন্দর চেহারা দেখিয়া প্রসংশা করিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া বসাইলেন। তাড়াতাড়ি কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া তাহার সহিত গল্পে মাতিলেন। সুকমল তাহাকে শুক্লার কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছে না। আজ যৌবনে পদার্পণ করিয়া তাহাকে লজ্জা যেন বড় বিপাকে ফেলিয়াছে। কথা প্রসঙ্গে দিদি শুক্লার কথা তুলিলেন। বলিলেন একটি ভাল সরকারী চাকুরে ছেলে পাইয়া ছিলেন তাহার সহিত শুক্লার বিবাহ দিয়া দিয়াছেন।

সুকমলের গলা শুকাইয়া গেল মনে হইলো কে যেন তাহার তানপুরার সব তার গুলি একটানে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। সে কোন কথা কহিতে পারিল না, শুধু কহিল অবেলায় বিদ্যালয়ে পূজার খিচুড়ি খাইয়া পেট ভর্তি হইয়া আছে। দিদির শত অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া বাহির হইয়া আসিল। শুধু মনে হইতে লাগিল, তাহার শৈশবের খেলার সাথীটিকে কে যেন কাড়িয়া লইয়া গেছে।

সুকমল কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার এখন কিছুই ভালো লাগে না। সারাদিন নানা কাজের মাঝে চোখ খুঁজিয়া ফেরে যদি কোনদিন পথে একবার শুক্লার সহিত দেখা হয়। এমনি করিয়া কতগুলি বছর পার হইয়া গেল। ছাত্র জীবনের এক বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষে সুকমল গ্রামের বাড়ীতে আসিয়াছিল, হঠাৎই শুক্লার সহিত দেখা। তাহাকে দেখিয়াই শুক্লা বলিল, কিরে কেমন আছিস? তাহার বিবাহ

হইয়াছে কিনা জানিতে চাহিল। হয় নাই শুনিয়া কিছু উপদেশ দেওয়ার লোভ সম্বরন করিতে পারিল না। জোর করিয়া তাহাকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া স্বামী ও পুত্রের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল।

শুক্লার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সুকমল ভাবিতে লাগিল কি বিচিত্র এ জগৎ সংসার। নারীরা কত শীঘ্র সব কিছু মানিয়া লইতে পারে। মনে মনে ভাবিল ঈশ্বর নারীকে কি দিয়া তৈয়ারী করিয়াছেন? তাহারা এক সংসারে বড় হইয়া অপর সংসারে এক অচেনা ছেলের হাত ধরিয়া গিয়া তাহাকেই আপন করিয়া লয়। বাল্যকালের বন্ধুবান্ধব বিসর্জন দিতেও সময় লয় না।

আজ তাহার সম্মুখ হইতে এক পাথর সরিয়া গেল। সে সব কিছু ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে আমি তাহার গল্পের রেশ টানিয়া ধরিলাম। ■

থানা থেকে আসছি

শরণ্যা মুখোপাধ্যায়

আকাশে তখন খুব মেঘ, বিকাল ক্রমশ ছোট হয়ে
হারিয়ে গিয়েছে, শুধু রেশটুকু বাকি।
মেয়েটির নাম জানা ছিল না কখনো
গাড়ীতে দেখেছি কিছুদিন। ছুটে ছুটে আসত।
চেনাশোনা ছিল সেইভাবে। হেসে বলে যত,
"আজ পেয়ে গেছি।" কটা দিন ছুটিতে ছিলেম।
আপিস-হেঁসেল থেকে দূরে।

আকাশ তখন জমকালো। আলো-আঁধারিতে মশগুল।
বরফ হাওয়ার ফাঁকে, সেদিন বিকালে দেখি সেই লোক,
হেঁটে আসে।
কৌতুহল হল। এগিয়ে গেলেম, ডেকে বল্লেম, কেমন?
খবর টবর ভালো? দাঁড়িয়ে পড়লে।
বল্লেম, বাকিরা কই? ক-বাবু, খ-বাবু,
গ-দিদি, ঙ-খান আর সেই ঘ-টি? তাকিয়ে রইলে।

পিছনে চাইতে দেখি, গ, ঘ, আর বোধকরি ক-টি ...
আবার পাগল হাওয়া...
ক-যেন কেমন চুপচাপ, গ-য়ের হাসিতে নেই শান, ঘ-টি
যেন কেমন কাহিল···

আশা নিরাশা

আকাশে তখন মেঘ, বিকাল তখন যেন রাতের প্রহরী।
সমূহ চত্বরে ভারী হাওয়া ।

“জয়েন করেছ নাকি? কবে এলে”, বিমান শুধাল।
বিমান আমারই বন্ধু, হঠাৎ চমক ভাঙ্গে ওর ডাকে।
“দাঁড়িয়ে এখানে? একা? গাড়ী দেবে আজ ওইখানে”।
বিমানের সহাস্য মুখে প্রশ্ন দেখে বলি, “তাই বুঝি, চল তবে”।
রোদেরা আমূল আজ নাস্তি।
ধীরে ধীরে হাঁটি ওর সাথে,
ভিতরে কেমন যেন অস্বোয়াস্তি।

“কি ভাবছ বল দেখি” –বিমানের অধৈর্য্য জিজ্ঞাসা,
ইতস্তত করে শেষে বলেই দিলেম, “সেই যে মেয়েটি, যার...”
“আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই মেয়েটি ত... ? দেখিনি ত তাকে বহুদিন...”
“আরে তুমি যে ছুটিতে ছিলে...”
“তার সব সাথীগুলি, ক-বাবু, খ-বাবু আর...” বাধা দিয়ে বলে উঠি আমি,

“ক-বাবু ত ধরা খেল জানি, খ-বাবু যে কিভাবে পালালো,
গ-য়ের বিষয়ে কি বা বলি, তবে ঘ এখনো যাতায়াত করে।
আমার অবিশ্যি ভাব ঙ আর চ-য়ের সাথেতে,

আশা নিরাশা

ওরা জানে সব কালোয়াতি, ফটাফট বলে কত কথা
আমিও শুনেছি সব, বাকিরা যেমন যা যা জানে,
তুমি ত ছুটিতে ছিলে, টেরই পাও নাই তাই বুঝি।"

গাড়ীতে এখনো দেরি দেখে, বসলেম কিছুটা ধারেতে
হাওয়াগুলি এখনো বিবাগী, এখনো আলেয়া, আলোগুলি
বিমান বোধহয়, গেল চায়ে,
আমি শুধু বিজনে একাকী, তাকালেম, যদি আসে
মেয়েটি, আমারো জানার ছিল কিছু, কথাগুলি পুরনো যদিও।
সমূহ চত্বরে শুধু হাওয়া আর হাওয়া।

"কাকে খুঁজছিলে, তখন অমন করে?" বিমান এসেছে ফিরে,
হাতে দেখি চায়েরি পেয়ালা।
"আজ হাওয়া বড় ভালো নয়, আপিসে আপিসে গুলতানি
সকলেরই তাড়া, বাড়ী যাবে, তুমি শুধু দেখি একা হাঁট ।"

আকাশ ক্রমশ কালো, গাড়ী এসে গেল।
দুধারে জ্বলন্ত জবা, পরিণতির মত রূপালি কাশেরা
হাওয়ারা ক্রমশ জল, আর গান, আর কিছু কলি
এ সকলি, পেরিয়ে পেরিয়ে,
স্তব্ধ বাষ্পগুলি এখন কেবল জমা
আমারি জানালা পাশে।
সবই ধুয়ে গেল, আমি ভাবি,
যেমত পথের' বালি, দেওয়ালে, দেওয়ালে লেখা ডাক।

আশা নিরাশা

যেমত বর্ণমালা, পাথারে আকুল পালাগুলি।

মেয়েটি জটিল বটে, শব্দলেখা তাই সুকঠিন।
অজানা কুমারী, কোথা পেলে পারাণি, প্রাচীন?

যার আর দিশা নাই কোন, নাই কোন অচেনা সাকিন...
যার কোন রেশটুকু কেউ, পাবেনা কখনো
শ্রাবণ বিকালে যার, সবটুকু নিয়ে গেল হাওয়া...

তবু কী যাবে না রয়ে,
কিছু কিছু শব্দরাশি
কালের গহীনে লেখা, গূঢ়তম বর্ণপরিচয়ে? ■

পাজি

প্রণব কুমার বসু

রোদে পুড়ে ঘামে ভিজে
এসে দাঁড়ালি একটু ছায়ার খোঁজে।
হেলমেটটা মাথা থেকে খুলতেই
দেখতে পেলাম কাঁচা পাকা চুলটাই।
মনে পড়ে গেল কলেজ লাইফের দিনগুলো
তারপর থেকে কে যে চলে গেল কোনচুলো...

ভীষণ স্বার্থপর ছিলিস তুই,
নোট দিতিস না হলে কলেজ কামাই।
কামাইয়ের পর গেলে কলেজে,
এমন ভাব করতিস কিছুই নেই তোর নলেজে...
যেচে কথা বলতে গেলেও দিতিস না পাত্তা,
যেন আমি কলেজে আসিনি এক হপ্তা।

কেন এমন হতো বলিসনি কখনো,
তবে বুঝতাম এটা তোর লোক দেখানো।
কলেজের হয়ে খেলতে গিয়ে যে বার ভাঙ্গলি হাত,
আরো কমে গেল বোধহয় আমাদের মধ্যে তফাৎ।
অনেকেই দেখতে যেত রোজ তোকে,
বুঝতাম তোর চোখ খোঁজে শুধুই আমাকে...

রোমন্থন

ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার পর দীর্ঘ ছুটি।
শুনেছিলাম তোরা বেড়াতে গিয়েছিলি উটি।
আমাকেও অনেকবার যেতে বলেছিলি
বাবার কারখানা বন্ধ - মনে পড়ে কষ্টের দিনগুলি...

রেজাল্ট বার হতেই চাকরি নিয়ে চলে গেলি দূরে।
কয়েকদিন পর বাবা মারা যান এক দুপুরে।
মামার বাড়ি থেকে সম্বন্ধ এলো,
খুব তাড়াতাড়ি বিয়ের জন্য জোর দিলো।
মায়ের কথা রাখতে আমায় হতে হলো রাজি...
এক ছেলে - এক মেয়ে... ছেলেটা তোর মতো পাজি। ■

চেতনা

অন্তর্দর্শন

সুজন ভট্টাচার্য

কি খুঁজে বেড়াচ্ছি সবাই সর্বক্ষণ,
সারাদিনে একবারও কি করি আত্ম-বিশ্লেষণ?
ভৌতিক এই দুনিয়ায় যা কিছু দরকার,
তার বাইরে নেই কি কিছুই ভাবার? ■

ক্ষণতন্ত্র!

একটি গণতান্ত্রিক ফাঁসি

প্রসূন কান্তি ভট্টাচার্য্য

খাস খবরে প্রকাশ রাজধানীতে একটি বহুতল বাড়ি ভেঙে পড়ে বেশ কয়েকজন নিহত ও অনেক লোক আহত হইয়াছে। এই খবর প্রকাশ হইবা মাত্র শহরে হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। বেতার ও দূরদর্শনের সমীক্ষা, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় ও চিঠিপত্র বিভাগ, বাসের ট্রেনের নিত্য যাত্রী, অফিসের কর্মচারী, চায়ের দোকানের নিয়মিত খরিদ্দার... সবাই এই বিষয়ে আলোচনা – সমালোচনা – নিন্দালোচনায় সরগরম হইয়া উঠিল। বিরোধীপক্ষ প্রতিবাদ আন্দোলন করিল এবং রাজার পদত্যাগ দাবী করিয়া (কুশ পুত্তলিকা না পাইয়া) খড়-পুত্তলিকা দাহ করিল। রাজার টনক নড়িল। রাজা তখন মন্ত্রী পরিষদদের ডাকিয়া ঘাসের গোড়া পর্যন্ত গণতন্ত্রকে প্রসারিত করিয়া একটি তদন্ত কমিশন বসাইলেন – এবং অবশ্যই তদন্ত কমিশনের নেতা হইলেন রাজার বাল্যবন্ধুর খুড়তুতো ভাইয়ের শ্বশুরের আপন শ্যালকের ভায়েরা ভাই।

গড্ডলতন্ত্রের, থুরি, গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী সন্দেহ জনক সকল ব্যক্তিকেই তদন্ত কমিশনে ডাকা হইল – এবং অবশ্যই রাজোচিত সমাদরে তাদের আপ্যায়নের পর জিজ্ঞাসাবাদ করা

হইল। প্রথমেই ডাক পড়িল প্রমোটারের। প্রমোটার বলিল, “আমিতো শুধুমাত্র অর্থ ঢালিয়াছি বাড়িটা করি নাই। বাড়ি করিয়াছে কনট্রাক্টর – অতএব দোষ কনট্রাক্টরের।” ডাকা হইল কনট্রাক্টরকে। কনট্রাক্টর বলিল, “আমি তো শুধু মিস্ত্রীদের নির্দেশ দিয়াছি, তাহারা মশলাপাতি মাখিয়া ইট গাঁথিয়াছে – দোষ তাহাদের।” ডাক পড়িল মিস্ত্রীদের যাহারা বাড়ি গাঁথিয়াছিল। মিস্ত্রীরা আসিল, তাহারা বলিল, “আমরা তো শুধু হেড মিস্ত্রীর নির্দেশে কাজ করিয়াছি, হেড মিস্ত্রীই বালি – সিমেন্টের ভাগ মিশাইয়াছিল দোষ তাহার।” হেড মিস্ত্রী আসিল, ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “হুজুর আমার দোষ নহে, আমি মশলা মিশাইবার সময়ে পাশের বাড়ির একটি বালিকা লাল জামা পড়িয়া দাঁড়াইয়াছিল, দেশে আমার ঐ বয়সের কন্যা আছে, লাল জামাটি দেখিয়া কন্যার কথা ভাবিতেছিলাম, তাই ভুল হইয়াছে। অতএব দোষ ঐ লাল জামার... – ঐ মেয়েটির বাবা যদি লাল জামা কিনিয়া না দিত তাহা হইলে আজ এতগুলি লোক মরিত না।” ডাক পড়িল মেয়েটির বাবার। সে আসিয়া বলিল, “হুজুর দোষ আমার নহে, দোকানে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, একটি লাল জামা কিনিলে একটি সাদা ফ্রক ফ্রি দেওয়া হইবে, তাই কিনিয়াছি। অতএব দোষ ঐ দোকানীর।” ডাকা হইল দোকানীকে। সে বলিল, “হুজুর দোষ আমার নহে, দোষ ওই লালা জামা তৈরী কোম্পানীর। তাহারা বলিয়াছিল, এক হাজার লাল জামা বিক্রয় করিতে পারিলে একটি মারুতি

গাড়ি পুরস্কার দেওয়া হইবে। তাই আমি সাদা ফ্রক ফ্রি দিয়া অধিক দামে লাল জামা বিক্রি করিয়াছি। অতএব দোষ ঐ কোম্পানীর মালিকের। ডাকা হইল কোম্পানীর মালিককে এবং কোম্পানীর মালিক আসিলেই তদন্ত কমিশনের তদন্ত এক দিনের জন্য স্থগিত হইল। কি কারণ? কারণ ঐ কোম্পানীর মালিক রাজার শ্যালকের বাল্যবন্ধু। তাহাকে শাস্তি দিলেই রাজার শ্যালক তো বটেই রানী পর্যন্ত রাজার মন্ত্রী পরিষদ হইতে সমর্থন প্রত্যাহার করিবে। অতএব চিন্তার বিষয়। রাজা তখন তদন্ত কমিশনের নেতাকে বলিলেন শারীরিক অসুস্থতার কারণে তদন্ত কমিশনের কাজ কিছুদিন স্থগিত রাখিতে, তাহার মধ্যে চিন্তা করিয়া উপায় স্থির করা হইবে – অবশ্যই এই সময়ের বেতন ঘরে বসিয়া ঠিকই পাইবেন।

এই সংবাদ বেতারে – দূরদর্শনে – সংবাদপত্রে রটিয়া গেল। দেশের পবিত্র নদী দিয়া অনেক জল গড়াইল – রাজকোষের অনেক অর্থ ব্যয় হইল – বিরোধী পক্ষ ইস্যু পাইল – আন্দোলন করিল। এবারে দুইটি (কুশের পুতুল নাই বলিয়া) খড়ের পুতুল পোড়ানো হইল, একটি রাজার অপরটি তদন্ত কমিশনের নেতার। অতঃপর সংবাদপত্রে শারীরিক সুস্থতার বিবৃতি দিয়া তদন্ত কমিশনের নেতা আবার তদন্ত শুরু করিল। ঘাসের গোড়া পর্যন্ত প্রসারিত গণতন্ত্রের দেশের নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশনের নেতার রিপোর্টের ভিত্তিতে এবং সুবিচারক – প্রজাদরদী – মহান রাজার বিচারে সেই লাল জামা প্রস্তুতকারক

ক্ষণতন্ত্র!

কোম্পানীর মালিকের ফাঁসির হুকুম হইল। নির্দিষ্ট দিনে প্রকাশ্য দিবালোকে আসামীকে ফাঁসিতে ঝুলানো হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। দেশের লোক ধন্য ধন্য করিল। একটা গণতন্ত্র বটে!

ফাঁসির দিনে ময়দান ভরিয়া লোক জড়ো হইল। রাজার এবং রাজার বিচারের জয়ধ্বনিতে ময়দান মুখরিত হইয়া উঠিল। যাহার ফাঁসি হইবে তাহার কথা গৌন হইল, ফাঁসির হুকুম হইল আসল। ঠিক সময়ে জল্লাদ আসিল, ফাঁসির দড়ি টাঙানো হইল, জনগণ জয়ধ্বনি বন্ধ করিয়া রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিল এবং ঠিক তখনই গোল বাঁধিল।

ফাঁসির দড়ির ফাঁস এত ছোট আর আসামীর গলা এত মোটা যে সে গলায় কিছুতেই ফাঁস লাগানো সম্ভব হইল না। কি হইবে – বিচারের রায় তো মানিতেই হইবে – ফাঁসি দিতে হইবেই এটাই বড় কথা। অতএব, গলার মাপে যদি ফাঁসি না হয় ফাঁসির মাপে গলা খুঁজিতে হইবে; ফাঁসি দেওয়া চাইই – চাই। অতএব, দিকে দিকে লোক ছুটিল ফাঁসির মাপে সরু গলার লোক খুঁজিতে . . .

#

পাঠক, আপনার জানা আছে নাকি এরূপ কোনো ব্যক্তি যার গলা অত্যন্ত সরু – অন্ততঃ ফাঁসির দড়ির মাপের – কোনো বন্ধ কারখানার ছাঁটাই শ্রমিক – কোনো শিক্ষিত বেকার যুবক – ফসলের দাম না পাওয়া কোনো চাষী – কিংবা কন্যাদায়গ্রস্ত কোনো পিতা - রাজার নিকট সন্ধান দিলে পুরস্কার মিলিবে বিশ্বকাপের টিকিট। ■

চিঠি পত্র

স্বাগতা পাঠক
লেখিকা

আমাদের এই প্রজন্মটা বই পড়া বা পত্রিকা পড়া প্রায় ভুলেই গেছে, সবটাই এই স্মার্ট ফোনের দৌলতে, আমিও তার মধ্যে অন্যতম। আজকাল তো নিউজ পেপারও অ্যাপএর মাধ্যমে হাতের মুঠোয়, ভুলেই গেছি সদ্য প্রিন্ট হয়ে আসা বইটার গন্ধ কেমন। বাজার জুড়ে আজও আছে কিছু নামী দামী পত্রিকা, যা হয়ত কিছু মানুষ পড়েন, বোধহয় সেই পড়াটুকুই আজ বিরাজমান। এর মাঝেই অনলাইনে পেলাম একটি পি ডি এফ পত্রিকা 'গুঞ্জন' (জুন ২০১৯)। ইন্টারনেটে পত্রিকা পড়তে খুব একটা অভ্যস্ত নই তাই তেমন নজর দিইনি, তবে এই 'গুঞ্জন' নামটা আমাকে বিশেষ ভাবে আকর্ষিত করল।

প্রথম থেকে পড়া শুরু করলাম। 'গুঞ্জন' পত্রিকার জন্ম কথা জেনে, আরও আগ্রহ বাড়ল। তারপর বেশ কিছু সুদক্ষ লেখক লেখিকার নাম আর তার সাথে নতুন কিছু রচয়িতার নামও বেশ আকৃষ্ট করলো। পড়া শুরু করলাম পি ডি এফ এ ৪০ পৃষ্ঠার এই পত্রিকা। প্রবন্ধ, গল্প, আর বেশ কিছু কবিতাতে ভরে উঠেছে 'গুঞ্জন'। অসাধারন লেখনি, আমি পড়তে পড়তে ডুবে গিয়েছিলাম।

অনেক না জানা তথ্যও আমার জ্ঞানের ভান্ডারে যুক্ত হলো। শুধু বলবো, কিছু মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে এই 'গুঞ্জন' পত্রিকা। এমন একটা সুন্দর উপহার আমাদের মাঝে যেন এই ভাবেই ছড়িয়ে যায়। দিনে দিনে, আরও বেশী করে বড় হয়ে উঠুক 'গুঞ্জন' এই শুভ কামনা রইল। আর সকলের কাছে অনুরোধ, আপনারা এই পত্রিকা পড়ুন, আর আপনাদের সকল কাছের মানুষ আর বন্ধুদের পড়ার জন্য উৎসাহ দিন। পড়ার মাধ্যমেই আমাদের সকলের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটুক... ■
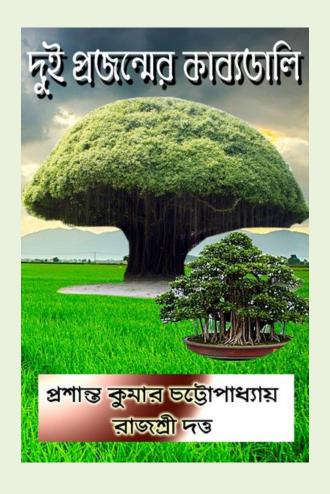
দুই প্রজন্মের কাব্যডালি
প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়
রাজশ্রী দত্ত

সবিনয় নিবেদন

'গুঞ্জন' কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের 'ই-মেল'এ (contactpandulipi@gmail.com) পাঠিয়ে দিন। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও থাকা চাই। ছবির সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর 'পাণ্ডুলিপি' 'গ্রুপে'তে অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: অগাস্ট সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ২০ শে জুলাই, ২০১৯।